

রাজবন্দীর জবানবন্দী

ইন্সানিটি

ভূমিকা : ড. রহমান হাবিব



রাজবন্দীর জবানবন্দী

ইব্রাহীম আলী

ভূমিকা :

ড. রহমান হাবিব

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

বুকস ফেয়ার ৯ ঢাকা

সূচিপত্র

ক. ভূমিকা	৫
খ. কাজী নজরুল ইসলাম : রাজবন্দীর জবানবন্দী	৯
গ. নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	১৫
ঘ. নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি	২০
ঙ. গ্রন্থপঞ্জি	২৩

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) কবি হিসেবেই সুখ্যাত। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তিনি বিশ্বসঙ্গীতাসনে মহান। ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও নাট্যকার হিসেবেও তিনি খ্যাতিমান। প্রাবন্ধিক হিসেবেও যে তিনি প্রাতিদ্বিক, দূরদর্শী, সাহসী ও স্বদেশপ্রেমিক—সেটিও তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থে খচিত আছে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে লেখা নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একটি সফল প্রতিবাদ।

নজরুলের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩) প্রবন্ধটি তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি লিখেছিলেন। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ-রাজ সম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজদের বিদ্রোহী ছিলেন বলে তাঁকে তারা রাজবিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করে রাজ কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন।

প্রবন্ধটির পরিধি মাত্র চার পৃষ্ঠারও কিছু কম। কিন্তু প্রবন্ধটির বিষয় ও ভাবগত ধারণাকর্মতা বিপুল ও ব্যাপক। প্রবন্ধের ভাষাশৈলীও তীক্ষ্ণ, গভীর, লক্ষ্যভেদী, শানিত, করুণার এবং প্রবল-গভীর সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ, তেজস্বী, সাহসী ও বিদ্রোহীপ্রবণতামূলক।

কবি এই প্রবন্ধে লিখেছেন, পক্ষ দুটো : একটি রাজার পক্ষ, যার হাতে রাজদণ্ড; অন্যটি কবির পক্ষ, যার হাতে সত্য এবং ন্যায়দণ্ড। রাজা অন্যায়ভাবে কবিকে বন্দি করেছেন, নেজনা কবি অবশ্যই সত্য-পক্ষের অর্থাৎ ন্যায়পক্ষের লোক; আর রাজা সত্য-বিরোধী, ন্যায়-বিরোধী, অন্যায় পক্ষের প্রতিনিধি।

রাজার পক্ষে নিযুক্ত রয়েছেন রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারীবৃন্দ। কিন্তু কবির পক্ষে রয়েছেন, 'সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।'

সকল রাজার রাজা এবং সকল বিচারকের বিচারক যিনি, আদি অনন্তকাল ধরে যিনি সত্য—তাঁকে কবি জাগ্রত ভগবান বলেছেন—সেই ভগবান আসলে শুধু হিন্দুধর্মের ভগবান নন; তিনি সকল ধর্মের সকল মানুষের চিরন্তন স্রষ্টা। হিন্দুরা তাঁকে বলে ভগবান, মুসলমানরা তাঁকে বলে আদ্বাহ, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তাঁকে বলে God—সকল ধর্মের সকল মানুষের সেই নিয়ন্তা একজনই—তিনি হলেন স্রষ্টা। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন লোক একজনমাত্র স্রষ্টাকেই বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে।

কবি লিখেছেন, কবির বিচারককে কেহ নিযুক্ত করেনি। এই মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলেই সমান। কারণ, তিনি তো স্রষ্টা স্বয়ং। তাঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট ও ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। স্রষ্টার আইন ন্যায় ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে রচিত। সে আইন কোন দেশবিজ্ঞতা মানব, কোন বিজিত-নির্দিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করেনি। সে আইন যেহেতু স্রষ্টা-উদ্ভূত, সেজন্য 'সে-আইন

বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট; সে-আইন সার্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের।'

নজরুল স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে স্থাপন করেছেন। পার্থিব রাজার পক্ষে যিনি কাজ করেন, তার লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ, ও অর্থ; অথচ কবি যেহেতু বিশ্বস্রষ্টার প্রতিনিধি; সেজন্য তাঁর লক্ষ্য সত্য ও পরমানন্দ লাভ।

রাজবন্দি হিসেবে রাজকারাগারে বসে নজরুল 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লিখলেও তিনি যেহেতু কবি; সেজন্য তাঁর জবানবন্দি একজন কবির জবানবন্দি। নজরুল লিখেছেন, তিনি কবি; অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্যে তিনি ভগবান কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। অর্থাৎ কবি এখানে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপিত। স্রষ্টা কবির মধ্যে Inspiration বা ভাগের ও বোধের প্রেরণা দেন বলেই কবির পক্ষে কবি হওয়া সম্ভব হয়েছে। কবির বাণীকে কবি শুধু সত্যের প্রকাশিকাই বলেননি; বলেছেন 'ভগবানের বাণী'। কবি লিখেছেন: "সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায় দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে, তাহা নিরপরাধ, নিরুদ্বিগ্ন, অম্লান, অনিবার্য সত্য-স্বরূপ।"

কবি নিজেকে ভগবানের হাতের বীণা বলেছেন। বীণা ভাঙলেও, ভগবান তো অতশূন্য ও চিরস্থায়ী-চিরজীব। সত্য যেহেতু স্বয়ংপ্রকাশ; সেজন্য সত্যকে কোনো রক্ত-আঁশি রাজদণ্ডে নিরোধ করতে পারবে না বলে কবি মন্তব্য করেছেন। কবি নিজেকে 'সেই চিরন্তন স্বরূপ-প্রকাশের বীণা' বলেছেন; যে বীণায় 'চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত' হয়েছে। এ ভাষ্যকে কবি দ্রুত সত্য হিসেবে মেনেছেন যে, সত্য যেমন আছে, ভগবানও তেমন আছে—এবং চিরকাল ধরে সত্য ও ভগবান—উভয়ই থাকবে। সত্যকে যে পার্থিব রাজা, ব্রিটিশ-রাজ রুদ্ধ করতে চাইছে, সে অহঙ্কার ও অন্যায়ের জবাব সে অবশ্যই পাবে।

কবি আরো বলেছেন, কবি হলেন সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোন নির্ভর্য শক্তি অবরুদ্ধ ও ধ্বংস করতে পারলেও যিনি এই বীণা-রূপী কবি কে বাজান—সেই 'বিধাতাকে' তো কেউ বিনাশ করতে পারবে না। কারণ, 'আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর।' কবির মৃত্যুর সময় আসলে কবিও মরবেন, সাম্রাজ্যবাদী-রাজা ও মরবেন; কিন্তু সত্য কখনো মরেনি, সত্য চির-প্রকাশক ও চির-জয়ী। কবি বিগত হলেও এই সত্যের বাণী অন্যের কণ্ঠ দিয়ে আবার প্রকাশিত হবে।

কবি লিখেছেন, কবি যে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাঁশি বাজান, সে সুর কবির বাঁশির নয়, সুর হচ্ছে কবির মনে এবং কবির বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। সেজন্য দোষ বাঁশিরও নয়; সুরেরও নয়—দোষ তাঁর, যিনি কবির কণ্ঠে বীণা বাজান—সেই ভগবানের। কবি-ভাষ্য স্মর্তব্য: "সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মত রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাহাকে বন্দী করবার মত পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই।"

কবির লেখায় ফুটে ওঠেছে সত্য, তেজ ও প্রাণ—কেননা কবির উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা। উৎপীড়িত আর্ন্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে কবি হলেন 'সত্য তরবারি'; তিনি হলেন

ভগবানের আঁখিজল। কবি তো জনতার স্বাধীনতা-প্রত্যাশী এবং তাদের আর্থনৈতিক মুক্তিরও সাহসী সৈনিক। সেজন্য কবির স্পষ্ট বক্তব্য : কবি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি; কবি বিদ্রোহ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

কবি যে রাজবিদ্রোহী হিসেবে ভগবানকে অভিযুক্ত করেছেন, এর কারণ এই যে, ভগবান তো পারেন পার্থিব ব্রিটিশ-সম্রাটসহ অন্যান্য অন্যায়কারী সম্রাটদের মনে ও মননে ন্যায়ের ও জনকল্যাণের বোধকে জাগ্রত করে দিতে। রবীন্দ্রনাথও ভগবানের উদ্দেশ্যে লিখেছেন যে, লোকভয়, রাজভয়—যাতে লোকে ভুলে গিয়ে দেশোন্নয়নের সাহিত্যের ভূমিকা পালন তাদের দ্বারা যাতে সম্ভব হয়।

কবি সত্যের পক্ষে বলে, জনগণের উপর অন্যায় ও অত্যাচারের বিপক্ষে বলে ভগবান কবির পক্ষে আছেন। মহাত্মা গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপের সময় এবং খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ (খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মত; ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মত এটি নয়) করার সময় সত্য সুন্দর ভগবানও তাঁদের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

নজরুল যা লিখেছেন, তা জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। ভারতবাসী স্বাধীনতা পাবে এজন্য লিখেছেন; ভারতবাসী আর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অত্যাচারমুক্ত হয়ে স্বাচ্ছন্দ্য-সুন্দর জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে—এজন্য লিখেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদী রাজা অত্যাচারী বলে সেই ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে গেছে নজরুলের বক্তব্য। সেজন্য কবি-ভাষ্য স্মর্তব্য : আমি 'যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়।' কিন্তু বিচারক তাঁকে শাস্তি দিতে পারে; কেননা বিচারক সত্যের পক্ষে নয়; তিনি রাজার পক্ষে। 'সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজত্ব।'

কবি প্রশ্ন-উত্থাপন করেছেন, এই বিচারক যদি সত্য, বিবেক ও ভগবানের সীমাকে মানতেন এবং রাজাও যদি তা করতেন—তাহলে তাদের দ্বারা অন্যায় সম্ভবিত হতে পারতো না।

পরাদীন ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদীদের দাস হিসেবে দিনাতিপাত করছে বলে নজরুল মন্তব্য করেছেন। কবি ব্রিটিশ-শাসকদের কৃত অন্যায়কে অন্যায় বলেছেন বলে তিনি রাজদ্রোহী হয়ে গেছেন। এটি তো কিছুতেই ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। 'অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন' কবির কণ্ঠে ফুটে উঠছে বলেই কবিকে রাজদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কবির এ কণ্ঠস্বরকে কবি, সমস্ত বঞ্চিত-নিঃস্ব-পীড়িত-অত্যাচারিত 'নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কবির ভাষ্য বুঝ স্পষ্ট : "আজ ভারত পরাদীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরপীড়িত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জনাভূমি উদ্ধার করার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মত অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামীর কাঠপড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।"

কবির আত্মা যেহেতু সত্যদ্রষ্টা স্বাধির আত্মা এবং কবি যেহেতু অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন—সেজন্য কবি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। অন্যায়কে অন্যায়, মিথ্যাকে মিথ্যা এবং অত্যাচারকে অত্যাচার বলায় কবিকে বিদ্রোহী বলা হয়েছে। কবি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেন নি; সমাজের, জাতির, ও দেশের বিরুদ্ধে কবির সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলে কবি মন্তব্য করেছেন। সেজন্য কবির উপর সে বিদ্রোহ, লাঞ্ছনা, অপমান, আঘাত এসেছে, সত্যকে এবং ভগবানকে হীন না করার জন্যেই কবি এগুলোকে সহ্য করেছেন।

লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ের মিথ্যাকে কবি কখনোই স্বীকার করে নেননি। অত্যাচারকে কখনোই মেনে নেননি। কারণ নইলে তো ভগবান কবিকে ত্যাগ করে যাবেন। কবির দেহ-মন্দিরে কবি জাগ্রত দেবতার আসনকে অনুভব করেছেন—সেজন্যই এ দেহ-মন্দিরকে মানুষ শ্রদ্ধা করে, পূজা করে। মানবদেহের মধ্যে যে আত্মা থাকে—সে আত্মা স্রষ্টার অস্তিত্ব-জ্ঞাপক এক চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা। মানুষের দেহের মৃত্যু হলেও মানুষের আত্মার মৃত্যু হয় না। সে আত্মাকে পাপমুক্ত রাখলে দেহ-মন্দির পূজা ও শ্রদ্ধার হয়ে ওঠে। একথাই কবি নজরুল উচ্চারণ করেছেন। সেজন্যই কবি বলেছেন : “কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি?” কবি নিজেকে ‘অমৃতের পুত্র’ বলেছেন। স্রষ্টার মহাত্মা যেমন অমর; মানুষের মধ্যস্থিত আত্মাও অমর। সেজন্য কবি নিজেকে বলেছেন অমৃতের পুত্র। কবির দুঃখ ও ভয় নেই বলেছেন এজন্যে যে, ভগবান কবির সঙ্গে আছেন।

কবি ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি বলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চেয়েছেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার কবি সহ্য করতে পারেননি বলেই তিনি বিদ্রোহী হয়েছেন। সমস্ত জনগণকে অত্যাচারমুক্ত এবং আর্থনীতিকভাবে স্বচ্ছল করতে চেয়েছিলেন বলেই নজরুল বিদ্রোহ করেছিলেন। মানুষের উপকার করা ও মানবকল্যাণ সাধন করা স্রষ্টারই নির্দেশ। সেজন্যই কবি লিখেছেন : “আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া বিরুদ্ধ হবে না।” নজরুল মূলত সত্যের বিজয় চেয়েছেন এবং ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যিক অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষকে লাভ করার উৎসাহকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই অসাধারণ-প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী প্রবন্ধে।

বিনয়ানন্দ:

২৬ জুন, ২০০৯
কুষ্টিয়া

ড. রহমান হাবিব
সহযোগী অধ্যাপক; বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

E-mail : drrahmanhabib@yahoo.com

১০/১০/১০
০০৫

রাজবন্দীর জবানবন্দী

রাজবন্দীর জবানবন্দী

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

এক ধারে রাজার মুকুট ; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড ; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য—জাগৃত ভগবান।

আমার বিচারকে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ-মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নিধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এর আইন—ন্যায়, ধর্ম। সে-আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে-আইন বিশ্ব-মানবের সত্য উপলব্ধি হতে সৃষ্ট ; সে-আইন সর্বজনীন সত্যের, সে-আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে—পবমাপু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি ; আমার পক্ষে—অনিঅন্তহীন অখণ্ড সৃষ্টি।

রাজার পেছনে ক্ষুব্ধ, আমার পেছনে রুদ্ধ। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ ; আমার পক্ষে যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্ধ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমৃত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাক্ষা দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে-বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে-বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুর্য্যবে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাপ, সত্য-স্বরূপ।

সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁধি রাজ-দণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে-বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা প্রব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণী রুদ্ধ করেছে, সত্যের বাণীকে মুক্ত করতে চাচ্ছে, সেও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টি অণু। তাঁরই ইঙ্গিত-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের আর অন্ত নাই ; সে যাহার সৃষ্টি তাহাকেই সে বন্দী

করতে চায়, শান্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্য প্রকাশের যন্ত্র। সে-যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে-যন্ত্র যিনি রাজান, সে-বীণায় যিনি রক্ত-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মর, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি—তার বাণী মরেনি। সে আজো তেমনি করে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সুর কোটাতে পারি। সুব আমার বাঁশির নয়, সুব আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়, দোষ আমার, যে রাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শান্তি দিবার মতো রাজ-শক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দী করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয় নাই।

রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তার প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তার অনুবাদে রাজ-বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে, কেননা তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আত্ম বিশ্বাসীর পাশে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।

আমি জানি এবং দেখেছি—আজ এই আদালতে আসামির কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজনিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার-গ্রহসন করে যেদিন খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো, গাঙ্গিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার ঐ বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে ধরধর করে কঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি, তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজ্যের। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।

তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন—এ কার? রাজার, না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শত্থ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অন্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।

আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুস্থান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায়-শাসন-ক্রিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী। এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল-বীরব ক্রন্দনের সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুজার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। ইষ্টাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবানীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।

আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ডই ভারতের অধীন হতো এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংল্যান্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আব ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনি বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে সে সময় এই বিচারক আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করেই বলছি।

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, —কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পৌঁধরি নাই, —আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার

সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, —তার জন্য ঘরে-বাইরের বিক্রম, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সবল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লোভের লোভে, রাজ্যভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তুর্য বেজে উঠেছিল; আমার হাতের ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ঋষে-নাচন নেচেছিলো। এ ঋষে-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তুর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যজ্ঞাবী মহাকল্পের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি হস্তিতে বুকেছিলাম। আমি তখনই বুকেছিলাম, আমি সত্য রক্তার, ন্যায় উচ্চারণের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শূশানের মায়া নিভিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্ৰদূত তুর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, হতটুকু ক্ষমতা ছিল তা নিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন ... প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি। কাবাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিকিত্ত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা-চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সর্বকণ প্রসাদ ঢাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঙ্গীতবিনী আমায় শান্ত, আমায় সঙ্গীতবিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজো-না-আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কাবাসাকে—অমৃতের পুত্র আমি—হাসিগানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবে। চিরশিশু প্রাণের উজ্জল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহি-এরোপুনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রক্ত ভগবান। অতএব, মাঁভে, ভয় নাই।

কাৰাগাৰে আমাৰ বন্দিনী মায়েৰ আঁধাৰ-শান্ত কোল এ অকৃতী পুত্ৰকে ডাক দিয়েছে। পৰাধীনা অনাধীন জননীৰ বুকু এ হতভাগ্যেৰ স্থান হ'বে কি-না জানি না, যদি হয় বিচাৰককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমাৰ ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি 'অমৃতস্য পুত্ৰঃ'। আমি জানি—

ঐ অত্যাচাৰীৰ সত্য পীড়ন
আছে তাৰ আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমাৰ ভাগ্য-বিধাতা
যাৰ হাতে শুধু রয়।'

প্ৰেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা।
৭ই জানুৱাৰি ১৯২৩।
বৰিবাব—দুগুৰ।

২০/২০২৩
০০৫

গ. নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ । ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাহামুদ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ । পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ । গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ । মাধুকন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ । কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বংশের চা কুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিকউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ । কাজী রফিকউল্লাহর সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর সিমলা, দরিদ্রামপুর গমন এবং দরিদ্রামপুর কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ । বানিগঞ্জের সিয়াবসোল রাজ কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজ্ঞানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। ব্রিটিশ পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯ নম্বর বাঙালি পদত্রে যোগদান।

১৯১৭-১৯ । দৈনিক জীবন, প্রধানত, করাচিতে গনজা বা অধিবাসিনীরা লিখিত অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার পদে উন্নতি, সাহিত্যচর্চা। কলকাতায় মাসিক সপ্তাহান্তে 'বাঙালির আত্মকাহিনী' গল্প এবং হৈমসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুহুর্ত' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ । মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ। সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ.কে. ফজলুল হকের সাক্ষাৎ-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুক্ত-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ । দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারত'-এ সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা গমন, কান্দিবপাড়ে ইব্রাহিম সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্সিস আসাদ খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ওরা আঘাট তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইব্রাহিম সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা গমন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে টানপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষদিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিনোদী' রচনা। 'বিনোদী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ : চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'বাথার দান'। প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর মাসে 'অগ্নিবীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ : জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহুবমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, আগস্টে 'বিষের বাণী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, শনিবারের চিঠিতে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ : মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের চক্ৰবর্তী, মহাজ্ঞা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহমদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাভল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাভল'-এর জন্যও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাভল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতা সংকলন 'চিন্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ : জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মতস্যাজীবি সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'প্রেমপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাকারী হুঁসিয়ার', কিম্বদন্তি সভায় 'কৃষ্ণাঙ্গের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন, 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভায় উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে' 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়া', 'মুদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ : ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি। বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সার্বভৌম মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড সার্ণ'

ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অস্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'আগর তুর্ক' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সত্যনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্যাণ', 'কলিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড় পিঠীতি বালির বাঁধ', প্রবন্ধ 'রক্ত' অর্থে 'ধুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে ধূনের মামলা' প্রবন্ধ। 'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইবরাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ গুয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮। ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মিস ফজিলাতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এগুতকাল। নোবেল মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শত্রু সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নিলীপকুমার রায়, নাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সজিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহী সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়াलिষ্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কুমিল্লার থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেসলি ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯। ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীকুয়াহ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভার সভাপতি আচার্য প্রমুখচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০। 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ ও কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গাফিল-আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে মুক্তি। কবির প্রিয় পুত্র কুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১। সিনেমা ও যাত্রা-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশগ্রহণ।

১৯৩২। নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩। গ্রীষ্মে 'বর্ষাবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'দ্রব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪। গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬। ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের' বনফারেন্সে সভাপতিত্ব।

১৯৩৮। এপ্রিলে কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার সভাপতিত্ব।

ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

- ১৯৩৯ । ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা ।
- ১৯৪০ । কলকাতা বেতারে 'হারামনি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার । দুগ্ধ রাগ-রাগিনীর উচ্চারণ ও নবসৃষ্ট রাগিনীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য । অক্টোবর মাসে নব পর্যায় প্রকাশিত 'নবযুগ'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত । ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ । প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ।
- ১৯৪১ । মার্চে বনগাঁ সাহিত্য-সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব । ৫ ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিত্বের শেষ তরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে' ।
- ১৯৪২ । ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত । ১৯শে জুলাই কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন । মধুপুরে অবস্থার অবনতি । ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ।
- অক্টোবর মাসের শেষের নিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুধিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি । অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন । কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন । সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
- মুগ্ধ-সম্পাদক—সজ্জনীকান্ত দাস ও জুলফিকার হায়দার
- কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—এ.এফ. রহমান, তারাগঙ্গর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভূষাবরাদি ঘোষ, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য, সৈয়দ বদরুন্নাছা, গোপাল হালদার । এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান ।
- ১৯৪৪ । বুড়েনব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ ।
- ১৯৪৫ । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান ।
- ১৯৪৬ । নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাওড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ । নজরুলের স্মৃতিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ । গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত ।
- ১৯৫২ । 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন । সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ । জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রুচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ । চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন ।
- ১৯৫৩ । মে মাসে কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন প্রেরণ । মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ । ভিয়েনায় বিখ্যাত হায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যাল হফ কর্তৃক সেবিত্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে । ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় ।
- ১৯৬০ । ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান ।
- ১৯৬২ । ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন । প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন । নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের মৃত্যু যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালে ।
- ১৯৬৬ । কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকা 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত ।

১৯৬৯। সম্বিতহারা কবির অসুস্থতার 'সপ্তবিংশ বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার স্ববীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১। ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক হাবানী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমন্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ান। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫। ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পি. জি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃশ্বাস জীবন।

১৯৭৬। ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রদান এবং নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট তরুণের বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রুসে-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্ষান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে রক্ত ও কফ বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না—সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই তারিখ ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সত্য ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুবাদন প্রচারিত হলে পি. জি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পি. জি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টি-এসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত কবির মরদেহে পুষ্প নিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্বরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে কবির জাতীয় পতাকা শোভিত মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়। কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ মোহাম্মদ সাঈদ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, ডি. জি. আর. প্রধান মেজর জেনারেল দত্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৯৮-২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।*

* স্বতর্বা, 'নজরুলের সপ্ততিতম জীবনপঞ্জি' অংশটি নজরুল রচনাবলী নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংকলন, ২০০৭ (ঢাকা, বাংলা একাডেমী) থেকে আমি সংগ্রহ করেছি—ড. রহমান হাবিব

ঘ. নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি

- মাথার দান ॥ গল্প । ফালগুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২ । উৎসর্গ—‘মানসী আমার। মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ফমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম’ ।
- অগ্নি-বীণা ॥ কবিতা । কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২ । উৎসর্গ—‘ভাড়া-বাংলার রাজ্য-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিম্বে’ ।
- যুগ-বাণী ॥ প্রবন্ধ । কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২ । বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬ ।
- রাজবন্দীর জবানবন্দী ॥ ভাষণ । ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ । পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ।
- দোলন-চাঁপা ॥ কবিতা ও গান । আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩ ।
- বিশেষ বাঁশী ॥ কবিতা ও গান । শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪ । উৎসর্গ—‘বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবের পবিত্র চরণারবিম্বে’ । বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫ ।
- ভাঙার গান ॥ কবিতা ও গান । শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪ । উৎসর্গ—‘মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে’ । বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয়ত সংস্করণ ১৯৪৯ ।
- রিক্তের বেদন ॥ গল্প । পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫ ।
- চিন্তনামা ॥ কবিতা ও গান । শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—‘মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিম্বে’ ।
- ছায়ানট ॥ কবিতা ও গান । আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ । উৎসর্গ—‘আমার শ্রেয়তম রাজলাহিত বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন আহমদ করকমলে’ ।
- সামাবাদী ॥ কবিতা । পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫ ।
- পূবের হাওয়া ॥ কবিতা ও গান । মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬ ।
- খিঞ্জে ফুল ॥ ছোটদের কবিতা । চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬ ।
- দুর্নিবের দাত্রী ॥ প্রবন্ধ । আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬ ।
- সর্বহারা ॥ কবিতা ও গান । আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬ । উৎসর্গ—‘মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিম্বে’ ।
- তান্ত্র-মঙ্গল ॥ প্রবন্ধ । ১৯২৭ ।
- ফণি-মনসা ॥ কবিতা ও গান । শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭ ।
- বোধনহারা ॥ উপন্যাস । শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭ । উৎসর্গ—‘সুর-সুন্দর শ্রীললিনীকান্ত রসকার করকমলে’ ।
- সিন্ধু-হিমোল ॥ কবিতা । উৎসর্গ—‘বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮ ।
- সঙ্কিতা ॥ কবিতা ও গান । আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮ ।
- সঙ্কিতা ॥ কবিতা ও গান । আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮ । উৎসর্গ—‘বিশ্বকবি স্মৃতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিম্বে’ ।
- বুলবুল ॥ গান । কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮ । উৎসর্গ—‘সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলে’ ।
- জিঞ্জীর ॥ কবিতা ও গান । কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮ ।
- চক্রবাক ॥ কবিতা । ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯ । উৎসর্গ—‘বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিম্বে’ ।
- নহা ॥ কবিতা ও গান । ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯ । উৎসর্গ—‘মাদারিপুত্র ‘শান্তি-সেনা’-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাধুজে’ ।

চোখের চাতক । গান । পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ । উৎসর্গ—‘কল্যাণীয়া বীণা-কণী
 শ্রীমতী প্রতিভা সোম জামুজাসু’ ।
 মৃত্যু-সুখ । উপন্যাস । মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০ ।
 কবাইয়াৎ-ই-হাফিজ । অনুবাদ কবিতা । আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০ । উৎসর্গ—‘বাবা
 বুলবুল!...’
 নজরুল-গীতিকা । গান । ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০ । উৎসর্গ—‘আমার গানের বুলবুলিয়া...’
 ঝিলিমিলি । নাটিকা । অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০ ।
 প্রলয়-শিখা । কবিতা ও গান । ১৩৩৭, আগষ্ট ১৯৩০ । গ্রন্থ বাজেন্দ্র ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ।
 কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এক ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ কবির
 জামিন লাভ, আপিল । ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সরকার
 পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে
 অব্যাহতি কিংবা ‘প্রলয়-শিখা’র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত । নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ ।
 কুহেলিকা । উপন্যাস । শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১ ।
 নজরুল-স্বরলিপি । স্বরলিপি । ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগষ্ট ১৯৩১ ।
 চন্দ্রবিন্দু । গান । ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১ । উৎসর্গ—‘পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমন্ঠাকুর—শ্রীযুত
 শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেশু’ । বাজেন্দ্র ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১ । নিষেধাজ্ঞা
 প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫ ।
 শিউলিমাল্য । গল্প । কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১ ।
 আনন্দা । গীতিনাট্য । ১৩৩৮, ১৯৩১ । উৎসর্গ—‘নটরাজের চির নৃত্যনায়কী সকল নট-নটীর
 নামে ‘আনন্দা’ উৎসর্গ করিলাম’ ।
 সুরদাকী । গান । আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২ ।
 বন-নীতি । গান । আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২ । উৎসর্গ—‘ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
 সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের গুস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দত্ত মোবারকে’ ।
 জুলফিকার । গান । আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ।
 পুতুলের বিয়ে । ছোটদের নাটিকা ও কবিতা । সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩ ।
 চল-বাগিচা । গান । আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩ । উৎসর্গ—‘বদেশী মেগারফোন বেকর্ড
 কোম্পানির সহকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিনয়সহ—’
 কাব্য-আমপাঠা । অনুবাদ । অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩ । উৎসর্গ—‘বাঙ্গালার
 নায়েবে-নবী নৌলবি সাহেবানদের দত্ত মোবারকে’ ।
 গীতি-শতদল । গান । বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪ ।
 সুরলিপি । স্বরলিপি । ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগষ্ট ১৯৩৪ ।
 সুরমুকুর । স্বরলিপি । আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪ ।
 গানের মালা । গান । কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪ । উৎসর্গ—‘পরম বেহতাজন
 শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—’ ।
 মজুর সাহিত্য । পাঠ্যপুস্তক । শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫ ।
 নির্ঝর । কবিতা ও গান । মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯ ।
 নতুন চাঁদ । কবিতা । চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫ ।
 মক-ভাস্কর । কাব্য । ১৩৫৭, ১৯৫১ ।
 বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড) । গান । ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ ।
 সঞ্চয়ন । কবিতা ও গান । ১৩৬২, ১৯৫৫ ।
 শেষ সওগাত । কবিতা ও গান । বৈশাখ, ১৩৬৫, ১৯৫৯ ।
 কবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম । অনুবাদ । অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯ ।

মধুমালা : গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
 ঝড় : কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
 ধূমকেতু : প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
 শিলে পটকা পুতুলের বিয়ে : ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
 রাজাজবা : শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
 নজরুল-রচনা-সম্ভার : আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
 নজরুল-রচনাবলী : প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬।
 কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
 নজরুল-রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭।
 কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
 নজরুল-রচনাবলী : তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফালগুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০।
 কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
 নজরুল-রচনাবলী : চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭।
 বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
 নজরুল-রচনাবলী : পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪।
 বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
 নজরুল-রচনাবলী : পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪।
 বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
 নজরুল-গীতি অখণ্ড : আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮।
 হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
 অপ্রকাশিত নজরুল : আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত। অক্টোবর ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯।
 হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
 লেখার রেখার রইল আদাল : কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮।
 নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
 জায়ে সুন্দর চির কিশোর : সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১।
 নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
 নজরুলের ধূমকেতু : নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। ফালগুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
 নজরুলের লাভল : নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
 কাজী নজরুল ইসলাম-রচনা সমগ্র : প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫।
 পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
 নজরুলের হারানো গানের খাতা : সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
 আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
 নজরুল-গীতি অখণ্ড : প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল-আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রজমোহন ঠাকুর। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।*

* স্বতর্ষা, 'নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি' অংশটি নজরুল রচনাবলী নজরুল-অনুশতাব্দী সংস্করণ, ২০০৭ (ঢাকা, বাংলা একাডেমী) থেকে আমি সংগ্রহ করেছি—ড. রহমান হাবিব

ঙ. গ্রন্থপঞ্জি

১. নজরুল-রচনাবলী, নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংকলন, ২০০৭ (ঢাকা, বাংলা একাডেমী)
২. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), আবদুল হক সম্পাদিত, (ঢাকা, বাএ, ১৯৮৮)
৩. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল হক সম্পাদিত, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)
৪. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড), নুরুল আশিন (সংকলিত ও সম্পাদিত) (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২)
৫. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), খোন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)
৬. কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), (খোন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত) (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)
৭. ড. অহীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (প্রথম খণ্ড) (কলিকাতা, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, ১৯৮৮)
৮. মিহির মুসাকী, কাজী আবদুল ওদুদের জীবনজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যান্দর্শ, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)
৯. ড. রহমান হাবিব, বিশেষ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭)
১০. রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, দর্শনচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা সংকলন, সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত (কলিকাতা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৮)। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচবনের 'রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ' প্রকল্পের ঘট্ট গবেষণাগ্রন্থ।
১১. ড. রহমান হাবিব, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং চিত্রশিল্পে ফোকলোর: বাঙালির হৃদয়-উৎসব (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭)
১২. রহমান হাবিব, নজরুল নন্দনতত্ত্ব : পুনর্গঠন ও সূত্রায়ণ (ঢাকা, ম. প্র., ২০০৫)
১৩. ইব্রাহিম হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)
১৪. শাহজাহান মনির, বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (ঢাকা, বাএ, ১৯৯০)
১৫. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধসংগ্রহ (কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৫২)
১৬. বাংলা একাডেমী চরিত্রাভিধান : 'জিনা' হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)
১৭. স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস (কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৭৫)
১৮. নজরুলের নির্বাচিত প্রবন্ধ, মুহম্মদ নুরুল হদা, রশিদুন নবী সম্পাদিত (ঢাকা, নজরুল ইসলাম ট্রাস্ট, ১৯৯৭)